

গোচারণের মাঠ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

Published by

porua.org

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই ‘গোচারণের মাঠ’ পড়িয়া
আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা ভূমিকা স্বরূপ প্রকাশ করিলাম,
ইহাতে আর কিছু না হয়, আমার আশার এবং আক্ষেপের কথা
ব্যক্ত করিবে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঃ বিশেষঃ

তোমার গোচারণের মাঠ পড়িয়াছি। ২৪ পৃষ্ঠা কাব্য খানির মধ্যে একটিও যুক্তাক্ষর নাই;—বাঙ্গালী ভাষা তোমার আজ্ঞাধীন, যদি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়া থাক, তবে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

তোমার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যুক্ত অক্ষর ছাড়িয়া দেওয়াতে একটা বড় সুফল ফলিয়াছে। অতি সরল বাঙ্গালী ভাষায় কাব্য খানি লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দে যুক্ত অক্ষর আছে, সে গুলি প্রায় সংস্কৃত মূলক। অতএব যুক্ত-অক্ষর পরিত্যাগ করিলে কাজে কাজেই কট মট, সংস্কৃতবহুল ভাষাও পরিত্যক্ত হয়; যে সরল বাঙ্গালায় লোকে কথা বার্তা কয়, সেই ভাষা আসিয়া পড়ে। ভাষা সম্বন্ধে ইহা সামান্য লাভ নহে। যত দিন না প্রচলিত বাঙ্গালায় বহি লেখার পদ্ধতি চলিত হয়, তত দিন সাধারণ লোকে বহি পড়িবে না; সাধারণ লোকে বহি না পড়িলে, লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে না, আর ভাষারও প্রকৃত পুষ্টিলাভ হইবে না।

এমন কথা বলি না, যে প্রচলিত বাঙ্গালায় যুক্ত-অক্ষর নাই; বা যুক্ত অক্ষর বিরল। যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়া দিলে, এমন কি অধিক ক্ষণ কথা বার্তা চলে না। তবে চলিত বাঙ্গালায় যুক্ত-অক্ষর কম, কেতাবি বাঙ্গালায় বেশী। তুমি দেখাইয়াছ, যে যুক্ত-অক্ষর একেবারে ছাড়িয়া দিয়াও ভাল ভাষায় ভাল কাব্য লেখা যায়।

যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া কবিতা লেখা, এই প্রথম নহে তাহা আমি জানি; “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল”—প্রভৃতি সকলেরই মনে আছে, আর তার পরও কোন কোন লেখক অসংযুক্ত বর্ণে কবিতা লিখিয়াছেন, এমনও স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে তুলনায় “গোচারণের মাঠের” একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সে গুলি ছন্দোবিশিষ্ট হইলেও, কবিতা নহে।—কবিত্ব সেগুলিতে প্রায় নাই। যে সকল শিশুরা যুক্ত অক্ষর ভাল পড়িতে পারে না, তাহাদিগের কাব্য পাঠের জন্যই সে গুলি লেখা হইয়াছে। কিন্তু ছেলেদের কবিত্ব-হীন কাব্য পড়াইয়া কোন লাভ আছে কি না—আমার সন্দেহ। লোকের বিশ্বাস আছে যে ছন্দ ও মিল বিশিষ্ট রচনায় ছেলেদের মন হরণ করে, সেই জন্য গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ছেলেরা ভাল বাসিতে পারে। কিন্তু ফলে কি তাই? অঃমিত কোন শিক্ষকের মুখে শুনি নাই যে ছেলেরা গদ্যপাঠ অপেক্ষায় পদ্যপাঠে অধিক মনযোগী হয়। বোধ হয়, যত দিন ছেলেরা পাঠ্য পদ্যে কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই পদ্যে কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন

আর কিছুষ্ট পাইবে না, তত দিন গদ্যে পদ্যে তাহাদের সমান আদর বা
অনাদর থাকিবে। ফলে, কবিত্ব-শূন্য কাব্য ছেলেদের পড়ান বিড়ম্বনা মাত্র।
বিদ্যালয়ে কাব্য গ্রন্থ পড়াইবার উদ্দেশ্য কি? সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে
কাব্যে ভাষা শিক্ষা ভাল হয়। পোপের প্রাচীন কথার দ্বারা অনেকে এ
সংস্কার সমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। বিদেশীয় ভাষার পক্ষে ইহা
সত্য হইলে হইতে পারে, দেশীয় ভাষার পক্ষে তত সত্য কি না,—আমার
সন্দেহ। বালককে কাব্য পড়াইবার এক মাত্র উদ্দেশ্য—আমি স্বীকার করি
—কাব্যের উন্নত ভাবের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। ইহা কেবল পদ্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় না
—কবিত্বের প্রয়োজন। তোমার এই “গোচারণের মাঠ” অতি সরল ভাষায়
লিখিত হইলেও, কবিত্ব-পূর্ণ। অনেক স্থানে উচু দরের কবিত্ব ইহাতে
দেখিয়াছি। ছেলেদের যদি কাব্য পড়াইতে হয়, তবে এই খানিই তাহার
উপযোগী। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা যে এ দেশের পাঠশাল স্কুলে চলিবে এমন
ভরসা আমি করি না। যদি চলে তবে আমি বিস্মিত হইব। যাহা চলিবার
যোগ্য তাহা চলিবে, শিক্ষা বিভাগের এমন নিয়ম নহে। শিক্ষা বিভাগে কেন,
যাহা চলিবার যোগ্য তাহা তুমি কোথায় চলিতে দেখিয়াছ?

টুঁচুড়া,
২২এ বৈশাখ, ১২৮৭

}

শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গোচারণের মাঠ।

অমল শামল তৃণ ঢাকা ধরাতল,
বহু দূর ভরপুর সবুজ কেবল;
অতিদূরে সমুখেতে রহিয়াছে কত,
থাক্ থাক্, কাল কাল, ধোঁয়া ধোঁয়া মত,
ছোট ছোট শৈল-মালা আকাশের গায়,
নিবিড় মেঘের মত বেশ দেখা যায়।
বামেতে আকাশ আসি পরশিছে মাটি,
হরিতে মিলেছে নীল অতি পরিপাটি;
উপরে আকাশ-পট কেমন সুনীল,
সাঁই সাঁই পাখা ছাড়ি ভেসে যায় ঢীল।
পিছনে বসতি ঘর, বাগান, সরাই,
পোঁতা উচা চালা ঘর, পালুই, মরাই।

সুগভীর সরোবরে ঢাকিয়াছে জল,
 কমলের পাতা আর কলমীর দল;
 মাথায় বটের চূড়া সেকেলে দেউল,
 আশে পাশে অনাদরের পুরাণ তেঁতুল;
 বেউড় বাঁশের ঝাড় মাথা নোয়াইয়া,
 কট্ কট্ রব করে থাকিয়া থাকিয়া।
 নিকটে বিটপী বট নিবিড়, অসাড়,
 গট হয়ে বসে যেন গাছের পাহাড়।
 অতিশয় উচু পাড়ে তিন সারি জাল,
 আধ ভাঙা বাঁধা ঘাট, চৌচীর চাতাল।
 ডাহিনে গহন বন—নীরব, বিশাল,
 এক পদে যোগ সাধে কত শত শাল;
 পাছে কেহ গোল করে, এই ভয়ে তারা,
 সারি সারি তাল-তরু বেখেছে পাহারা।
 যোগ সাধনের কাল রাতি পোহাইল,
 সোণার দুয়ার খুলি উষা দেখা দিল;
 পবন বলিল মৃদু সবাকার কাছে,
 উষা দেখা দিল আর, ঘুমাতে কি আছে?
 যোগীদের পাহারায় তাল আছে খাড়া,
 দেহ বাড়ি, মাথা নাড়ি, দিল তার সাড়া;
 তালপাত অসি তুলি ঝনাং করিল,
 সেই রবে শাখীদের সমাধি ভাঙিল।
 মাথা তুলি, চোখ মেলি, চৌদিকে চাহিল,
 কুসুম কুমারী উষা নয়নে হেরিল;
 লাজ পেয়ে ধীরি ধীরি শিরে দিল তাজ,
 হীরা মরকত তাহে মুকুতার কাজ;
 তাজ পরি সমাদরে মাথা নোয়াইল,
 লোহিত কপোলে উষা ঈষৎ হাসিল।
 উষাপতি হাসে তাহে উষার অঁদরে,
 উজলে অরুণ আঁখি নব-রাগ ভরে;
 সে হৈম হাসিতে বন ভাসিয়া উঠিল,
 শামল সবুজে হাসি গড়ায়ে চলিল।
 আকাশের হাসি গিয়া মিশিল আকাশে,
 সুনীল আকাশে হাসি আপনিই হাসে।
 জগতে জাগতে গতি করিল সমীর,
 ঈষৎ কুপিত তবু অতীব সুধীর;
 দুলালী লতারে ধরি ধীরে দুলাইল,

পাতার ভিতর হতে	ফুল দেখা দিল।
তরুরে তাড়না করি	যায় বায়ু চলি,
শাখীর কোলেতে পাখী	করিল কাকলি।
চলিল কাকের সারি	পাখা দুলাইয়া,
আগেতে রসিল আসি	বাঁশঝাড়ে গিয়া,
মহাশোর গোল করি	তথা হতে উড়ে
বসিল চালের পরে,	মরায়ের চূড়ে;
সারকুড়ে পড়ে গেল	অতিশয় ধূম,
কাকারবে কৃষকের	ভাঙাইল ঘুম;
পিঁড়িতে ননদী উঠি	বিছানা তুলিল,
দুয়ার খুলিয়া বধু	বাহির হইল।
দুহাতে দুগাছি কড়	গায়ের গহনা,
নাহি বেশ, রুখু কেশ,	মলিন বসনা;
কপালে সীদুর হেরি	মনে লয় হেন,
শীত ঋতু রাতি শেষে	শুকতারা যেন;
সতীভাব, সরলতা	ভাসাল নয়নে,
অশোক বনের সীতা	কৃষক ভবনে।
কাঁখেতে কলসী লয়ে	চলে ধীরে ধীরে,
চুপে চুপে নামে বালা	সরোবর তীরে,
কে যেন কাহার কথা	কাণেতে বলিল,
সমবয়সীরা হেরি	সলাজ হাসিল।
চোখ মুছে, মুখ ধুয়ে	উঠে জল লয়ে,
বাঁকা হয়ে গুটি গুটি	চলিল আলয়ে।
উঠেছে কৃষক ভায়া	হঁকা ধরিয়াছে,
তার সনে করে এবে	তুলনা বা আছে?

রাখাল গোপাল-লয়ে	গোচারণে যায়,
হাতেতে পাঁচনবাড়ি,	টোকাটি মাথায়,
মালকোঁচা কটিতটে,	কোঁচড়েতে চা'ল
‘ধেই ধেই’ করি গোরু	করিছে সামাল।
পুকুরের পাড় ছাড়ি	ধরিল জাঙাল,
বটতলা পিছে ফেলি	চলিল গোপাল।
রাঁখাল দাঁড়ায়ে রয়	বটতরু ঘিরে,
গোচারণ মাঠে গাভী	চরে ধীরে ধীরে;
অমল শামল ঘাসে	ঢাকা ধরাতল,
বহুদূর ভরপুর	সবুজ কেবল।

রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট তরু ঘিরে,
গোচারণ মাঠে গাভী চলে ধীরে ধীরে;
তিন, চারি, পাঁচ, ছয়,—দলে দলে চলে,
মচ মচ করি ঘাস ছিঁড়য়ে দুকলে;
শামলী ধবলী রাঙা কেমন দেখায়,
খুটি খুঁটি ঘাস খায়, গুটি গুটি যায়;
এক পা দুই পা যায়, মাছী লাগে গায়,
শিঙ ঝাড়ে, মাথা নাড়ে, লাঙুল দোলায়;

তড়িত চালনা মত শরীর কাঁপায়,
বসিতে না পারে মাছী উড়িয়া বেড়ায়;
ডাহিনে বামেতে ফিরে, সোজা নাহি চলে,
নতুন নতুন ঘাস খায় দুই কলে।
কুটি কাটি নাহি মাঠে, অতি নিরমল,
নীহারে ভিজান তৃণ, সুচারু শামল,
কাঁথার মতন পুরু, কেমন কোমল,
তুলার তোষকে যেন ঢাকা মখমল;
তরুণ তপন আভা খেলে তদুপরি,
চক্ চক্ করে মাঠ যে দিকে নেহারি।
দেখিতে দেখিতে রবি গগনে উঠিল,
দেখিতে দেখিতে মাঠ ঝকিতে লাগিল।

রাখাল দাঁড়ায়ে ছিল বটতলা ঘিরে,
হাতেতে পাঁচন বাড়ী, টোকা বাঁধা শিরে;
দেখিতে আছিল সেই আপনার মনে,
ভোরের ভানুর ছটা বিভোর নয়নে;
পলকে পলকে রবি থকে থকে উঠে,
ঝলকে ঝলকে বিভা চারি দিকে ছুটে;
চাহিতে চাহিতে তার চমক হইল,
এ উহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল;

বটের শিকড়ে রাখি টোকা আর বাড়ী
দোল খাইবারে সবে করে তাড়াতাড়ি;
যে যার দোলনা চাপি খাইতেছে দোল,
পায়ে পায়ে ঠেলাঠেলি, বুক বুক কোল;
কালু মাথে টুসি দিয়া দুলেছে কানাই,
ফিরিবার কালে কালু তারে ছাড়ে নাই।
জটির জটার গেরো গিয়াছে খুলিয়া
এক জটা এক হাতে রহিল ঝুলিয়া,